গল্প, যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে **ঈমান সিরিজ**

পরকাল ও ভাগ্য কী

সিদ্দিক স্বপন

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

মৃত্যু আসলে কী	৯
জন্ম ও মৃত্যু	১৪
মৃত্যুর পর আমাদের কী হয়	১৬
কবর কেমন জায়গা	১৯
হাশরের দিনের ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটবে	২৮
মৃত্যুর পর আমরা কীভাবে আবার জীবিত হব	৩১
কে পচে যাওয়া হাড়গুলোকে জীবন দান করবেন	৩৮
ভালো-মন্দ কাজের বিচার হবে কীভাবে	৩৮
হাশরের দিনে বিশ্বনবি কি আমাদের সঙ্গে থাকবেন	৪২
আমরা পুলসিরাত পার হব কীভাবে	৪৭
জান্নাত দেখতে কেমন	৫০
কে জাহান্নামে যাবে	৫৬
কদর বা ভাগ্য কী	৬৮
সবকিছুর ভাগ্য আছে	৭২
আমরা যা কিছু করব, সবই কি ভাগ্যের লিখন	৭৫
কেন কেউ ধনী আর কেউ কেউ গরিব	৭৭
কেন কেউ দেখতে সুন্দর আর কেউবা কুৎসিত	৮২
আল্লাহ যেহেতু সব জানেন, তাহলে এতে আমার দোষ কী	৯০
সর্বশেষ কিছু কথা	৯৪

মৃত্যু আসলে কী

আমার ছোটোবেলার কথা বলছি। তখন আমার বয়স ছয়। সেদিন আমি ও আমার বন্ধু মনির একটা বকুলগাছের নিচে বকুল ফলের বীজ কুড়াচ্ছিলাম। স্কুলে আমাদের তখন যোগ-বিয়োগ শেখার জন্য এই বীজগুলো স্যার নিয়ে যেতে বলেছিলেন। ওগুলো দিয়ে খুব সহজেই অঙ্ক করে ফেলা যেত। যেমন : পাঁচের সাথে পাঁচ যোগ করলে কত হবে? সহজভাবে পাঁচটা বীজের সাথে আরও পাঁচটা যোগ করে গুনলে দশটা পাওয়া যাবে। কত সহজভাবে করা হয়ে যেত অঙ্ক!

বকুল ফুলের সুগন্ধে চারদিকটা মৌ মৌ করছিল।

এমন সময় দেখলাম, অনেকজন লোক একসাথে হেঁটে আসছে। বেশির ভাগের পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি। এর মধ্যে কয়েকজন তাদের কাঁধে একটা কাঠের খাটিয়া বহন করছিলেন। খাটিয়াটি একটা সাদা কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল। সবাই উচ্চৈঃস্বরে 'আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' কালিমটা পাঠ করছিল। আমিও এই কালিমাটা পারতাম। আম্মু ছোটোবেলাতেই আমাকে পাঁচটি কালিমা মুখস্থ করিয়েছিলেন।

সেদিন আমি প্রথম মৃত্যু সম্পর্কে জেনেছিলাম। আমার বয়স তখন ছয় বছর। আমি তাকিয়ে ছিলাম খাটিয়া বহনকারী লোকদের দিকে। তারা লাশকে দাফনের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে নিয়ে যাচ্ছিল।

মনির আমাকে বলল—'চল, ওই বাড়িটিতে যাই।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কোন বাড়িতে?'

সে উত্তর না দিয়েই আমার হাত ধরে টেনে যে বাড়িটি থেকে খাটিয়াটি বহন করে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে নিয়ে গেল।

আমি দেখলাম, মহিলারা চিৎকার দিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছে। এর আগে এভাবে আমি কাউকে কাঁদতে দেখিনি। অনেক পুরুষও ছিল। তারা মহিলাদের চুপ করতে বলে নিজেরাও কাঁদছিল। এর আগে আমি বয়স্ক কোনো লোককে কখনোই কাঁদতে দেখিনি।

তাদের কান্নাকাটি, রোনাজারি দেখে মনিরও কাঁদতে লাগল। আমার চোখেও পানি এলো। আমি জানি না, কেন কাঁদছিলাম। কিন্তু এটা বুঝেছিলাম— তাদের এমন কিছু হারিয়েছে, যা আর কখনো তারা ফিরে পাবেন না।

মনির খুবই চালাক একটা ছেলে। দুনিয়ার এমন কিছু নেই—যা সে জানত না। তাকে আমরা সবজান্তা শমসের নামে ডাকি তার বুদ্ধির কারণে। আমি তাকে যা-ই জিজ্ঞেস করতাম—ভুল কি শুদ্ধ, সে একটা না একটা উত্তর দিতই দিত।

‘মনির, ওই বাক্সে কী ছিল।’

‘গাধা, ওটা কোনো বাক্স ছিল না।’

‘কী তাহলে ওটা?’

‘লাশের খাটিয়া।’

‘লাশের খাটিয়া কী?’

‘তুই জানিস না, মানুষ মারা যায়?’

‘জানি তো। স্কুলে স্যার বলেছিলেন।’

‘মানুষ মারা গেলে ওই খাটিয়ায় করে তাকে রেখে আসা হয়।’

‘কোথায়?’

‘কোথায় আবার? কবরস্থানে।’

‘কবরস্থান কী?’

‘যেখানে অনেক কবর থাকে।’

‘কবর কী?’

‘মানুষ মারা গেলে তাকে মাটি দেওয়া হয়, জানিস না?’

‘মাটি দেওয়া হয়!’

‘হ্যাঁ, মাটি দেওয়া হয়। প্রতি শবেবরাতের রাতে আব্বু আমাকে কবরস্থানে নিয়ে যান জিয়ারতের জন্য। আর আম্মা কুরআন পড়েন, দুআ করেন।’

‘একটা মানুষকে মাটি দেওয়া হয়?’

‘মানুষ না। লাশকে মাটি দেওয়া হয়।’

‘লাশ কী?’

‘তুই জানিস না?’

‘না।’

‘তুই মরে গেলে তুইও লাশ।’

‘আমি মরতে চাই না।’

‘সবাইকেই একদিন মরতে হবে।’

‘সবাইকেই?’

‘হ্যাঁ, সবাইকে।’

‘কিন্তু কেন?’

‘এটাই নিয়ম।’

‘আচ্ছা, কবরে কী হয়? যাদের কবরে রেখে আসা হয়, তারা ওখানে কী করে?’

‘লোকটা ভালো কাজ করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন।’

‘এভাবেই জান্নাতে যেতে হয়?’

‘না মরলে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।’

‘তাহলে তো কবর ভালো জায়গা।’

‘হ্যাঁ, যারা জান্নাতে যাবে তাদের জন্য ভালো জায়গা। কিন্তু...’

আমরা চুপ করে খাটিয়া বহনকারী লোকদের দেখতে লাগলাম। একসময় রাস্তা থেকে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর হঠাৎ করেই যেন নীরবতায় ছেয়ে গেল চারদিকটা। সুনসান নীরবতা। টুঁ শব্দটা পর্যন্ত নেই।

একটু পর মনির আমার কাঁধে হাত ভর করে বলল—‘গত সপ্তাহে যা বৃষ্টি হলো না।’

‘হুম। বেশ কদিন স্কুল মিস হয়ে গেছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ। ফুটবল মাঠটা পানিতে ভরে গিয়েছে।’

‘হুম। দেখেছিলাম।’

‘আর অনেক ব্যাঙাচি আছে সেখানে।’

‘ব্যাঙাচি কী?’

‘হাদারাম! ব্যাঙাচি চিনিস না? আরে, ব্যাঙের বাচ্চা। ওগুলো বড়ো হয়ে ব্যাঙ হয়।’

‘তাই নাকি? ’

‘চল, দেখতে যাই। যাবি?’

‘চল।’

ওইদিন পলিথিনে আমরা কাদা মাখামাখি করে অনেকগুলো ব্যাঙাচি ধরেছিলাম। খুব মজা করেছিলাম। অবশ্য মাঝেমধ্যে রাগারাগি ও ঝগড়াও হয়েছিল; কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল।

এর মধ্যেই পলিথিনের ব্যাগে একটা ব্যাঙাচি মরে যাওয়ায় আমরা সবগুলোকে পানিতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, যেন সেগুলো বেঁচে যায়। এতে মৃত্যু কী, তা হালকা টের পেয়েছিলাম।

এরপর আর মৃত্যু, লাশের খাটিয়া কিংবা কবরস্থান নিয়ে মনিরের সঙ্গে কোনোদিন কথা হয়নি আমার।

খুব সম্ভবত এক কি দুবার, আমি মনিরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—‘তাহলে জান্নাতে যাওয়ার আগে মানুষ কবরে কতদিন থাকে?’

সে আমাকে প্রজাপতির ডিম কীভাবে লার্ভায় পরিণত হয়, কীভাবে লার্ভা কোকুন তৈরি করে, এরপর কোকুন কেটে বড়ো প্রজাপতি বের হয়ে আসে—এসবের গল্প শুনিয়েছিল। আমি কিছুই বুঝিনি। প্রজাপতির সঙ্গে জান্নাতের কী সম্পর্কে, তাও বুঝতে পারিনি।

মৃত্যু নিয়ে আর আমাদের মধ্যে কোনো আলাপ হয়নি। মনির মৃত্যু সম্পর্কে আগে থেকেই জানত। কারণ, মনিরের বাবা মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যু কী জিনিস, তা সে অনেক ছোটো থেকেই জানে। আমি কিছুই জানতাম না মৃত্যুর ব্যাপারে।

ছোট্ট লেজার লাইটের মতো সন্ধ্যাতারাগুলোর ঝিকমিক করে জ্বলার দৃশ্য দেখলেই ঘুম পায় আমার। এমনই এক নাদান বালক আমি।

রাতের বেলা উইপোকাগুলো রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের দলবেঁধে ওড়াউড়ি করত। যেন কারও বিয়ের নৃত্যে তারা অংশগ্রহণ করেছে। আমি মনভরে তাদের এই ওড়ার দৃশ্য দেখতাম। সন্ধ্যাতারাগুলোর দিকেও একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম।

এত সবের ভিড়ে মৃত্যু কী, মৃত্যুর পর কবরে কী হয়, মারা গেলেই কেউ কীভাবে জান্নাতে যাবে—এই প্রশ্নগুলো আমার মাথায় কখনোই আসেনি। এরপর মনিরের সঙ্গে সেদিন মৃত্যু কী, তা জানলাম। তখন আমার বয়স ছয়।

আর এতদিনে আমি মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছি। কিন্তু তথাপি এমন অনেক বিষয় আছে, যা মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু আমি জানি না।

উদাহরণ দেবো? যেমন : আমি এখনও জানি না, মরে যাওয়া বলতে আসলে কী বোঝায়।

মারা যাওয়া আসলে কী? সত্যি বলতে, এই প্রশ্নের উত্তরটা এখনই যদি পাওয়া যেত, তাহলে আমি খুব খুশি হতাম। তবে একদিন না একদিন আমি এটা খুঁজে বের করবই। তা করতে হলে আমাকে মারা যেতে হবে। তখন বুঝব, মারা যাওয়া জিনিসটা আসলে এটা।

কিন্তু আমি যা বুঝব, তা তোমাকে বলা সম্ভব হবে না। কারণ, আমি আর এখানে থাকব না। তুমি কি বুঝতে পেরেছ?

মৃত্যু আসলে কী? এটা বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, আমাদের জন্মগ্রহণের ব্যাপারে ভাবা।

জানি, তুমি অবাক হয়েছ। ভাবছ, আলোচনা করছি মৃত্যুর কিন্তু কথা বলছি জন্ম নিয়ে। অথচ মৃত্যু আর জন্মের মধ্যে অনেক দূরত্ব; মৃত্যুর সাথে জন্মের সম্পর্কে কী?

আছে। সম্পর্ক আছে।

জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসা আর মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মাঝে অনেক মিল আছে।

জন্ম ও মৃত্যু

যদি মায়ের গর্ভে থাকা কোনো বাচ্চাকে বলা সম্ভব হতো, তুমি একদিন এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে! আমি নিশ্চিত, বাচ্চাটা যারপরনাই অবাক হতো! ভয়ে কাঁপত। বিশ্বাসই করতে চাইত না।

'কি! আমি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব?'

'হ্যাঁ, চলে যাবে। তুমি জন্ম নেবে।'

'কি! জন্ম নেব?'

'হ্যাঁ। বাকি সব বাচ্চার মতো তুমিও জন্ম নেবে। তুমি এই জায়গা ছেড়ে এমন এক জায়গায় যাবে, যেখানে চোখ মেলে দেখার মতো অনেক কিছু আছে।'

'আমার ভয় লাগছে। আমি জন্ম নিতে চাই না। এই জায়গাটিই অনেক সুন্দর।'

'তুমি চাও বা না চাও, জন্ম তোমাকে নিতেই হবে। কিন্তু ভয় পেয়ো না। জন্ম নেওয়ার পর তুমি এমন এক জায়গায় যাবে, যা এখানকার তুলনায় অনেক অনেক বেশি সুন্দর। পৃথিবীর সঙ্গে এই জায়গার তুলনায় হয় না।'

'তুমি কি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই। আমি নিশ্চিত। তুমি এটা বুঝবে যখন এই অন্ধকার জায়গা ছেড়ে পৃথিবীতে যাবে। চোখ মেললেই নীল আকাশ, রাতের ঝিকিমিকি তারা, রঙিন ফুল...আরও কত কী যে দেখবে!'

'নীল আকাশ, রাতের তারা, রঙিন ফুল—এসব সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমার কল্পনাতেও এসব কোনোদিন আসেনি। তুমি আমাকে যা বলছ, আমি বুঝতেই পারছি না এসব কী জিনিস! আমার ভয় লাগছে।'

মানুষ যা জানে না, তা-ই ভয় করে। যেমন : আমরা জিন, ভূত সম্পর্কে জানি না বলেই এসব ভয় পাই। জন্ম নিতে হবে, এই খবরটা একটা বাচ্চাকে খুবই

ভীত করে তুলবে। কারণ, সে জন্মের পর যেখানে যাবে সেই নতুন জগৎ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। সে জানে না পৃথিবী কি!

তাই তার জন্য জন্মের অর্থ হলো মৃত্যু। তাহলে আমরা বুঝলাম, মায়ের পেটে অবস্থানকারী বাচ্চার জন্য জন্ম নেওয়া সবচেয়ে ভালো। কেননা, সে খুব ছোটো ও অন্ধকার একটা জায়গায় থাকে।

আমার মনে হয়, কোনো বাচ্চা যদি জানত—জন্মের মাধ্যমে সে এত সুন্দর একটা জায়গা পৃথিবীতে আসতে চলেছে, তাহলে জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে কান্নাকাটি করত না; বরং চোখ মেলেই কিউট হাসি হেসে বলত—'ওয়াও! পৃথিবী এত সুন্দর!'

আমাদের অবস্থাও মায়ের পেটের বাচ্চাটির মতো। এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস সবকিছুকে আমরা ভালোবেসে ফেলেছি। নীল আকাশ, রাতের তারা, সুন্দর সুন্দর ফুল, রুপালি ঝরনা—সব আমাদের কাছে অনিন্দ্যসুন্দর লেগেছে। এই জীবনকে আমরা খুব সুন্দর উপভোগ করছি। আর তাই যখনই বলা হয়, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব—আমরা কষ্ট পাই। আমাদের মন দুঃখভরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আমরা ব্যথাতুর হৃদয়ে বলি—'এত সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে?'

ঠিক মায়ের পেটে থাকা জন্ম না নেওয়া বাচ্চাটির মতোই আমরা ভয় পাই মৃত্যুর কথা শুনলে। আসলে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাই না। অনন্ত অসীম সময় ধরে এখানে বাস করতে চাই।

আল্লাহ মায়ের পেটের বাচ্চাটিকে ওই ছোটো, অন্ধকার জগতে বেশি দিন রাখতে চান না। তাই জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠান।

ঠিক তেমনই, আমরাও মৃত্যুর মাধ্যমে আরেকটা পৃথিবী, আরেকটা জগতে যাব, যা এই পৃথিবীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি সুন্দর। এই পৃথিবীর তুলনায় অনেক গুণ বড়ো।

মায়ের গর্ভের তুলনায় এই পৃথিবী যেমন অনেক সুন্দর, অনেক বড়ো; আমাদের মৃত্যুর পর আমরা জান্নাতে যাব, ইনশাআল্লাহ। আর জান্নাত এত বেশি সুন্দর ও বিশাল যে, এটা অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য।

আর এটাই হলো মারা যাওয়া বলতে যা বোঝায়। বুঝেছ?

মৃত্যুর পর আমাদের কী হয়

এই প্রশ্নের উত্তর শোনার পর তুমি চমকে যাবে। অবাক হবে। তবে একটু পরেই বুঝতে পারবে আমার কথাই আসলে ঠিক।

আমরা যখন মারা যাই, আমাদের আসলে কিছুই হয় না। আমরা আগের মতোই থাকি। যা ঘটে, তা হয় আমাদের শরীরের সাথে। কিন্তু আমাদের রুহ বলেও একটা জিনিস আছে। এটাই আমাদের অস্তিত্বকে ধারণ করে।

আমি জানি, তুমি বেশ অবাক হয়েছ। আচ্ছা ঠিক আছে। চলো, এবার তোমাকে একটা উদাহরণের মাধ্যমে এই বিষয়টা বুঝিয়ে দিই। আশা করি, তুমি বুঝতে পারবে আমি কী বলতে চেয়েছি।

তুমি নিশ্চয় নভোচারী দেখেছ? না মানে কার্টুন বা মুভির বাইরে সরাসরি নিজের চোখে নভোচারী দেখোনি, তাই না?

ব্যাপার না। এটা কোনো সমস্যা না। আমিও সরাসরি কোনো নভোচারী দেখিনি।

তো, যখন নভোচারীরা রকেটে করে মহাবিশ্বে যায়, তাদের একটা বিশেষ পোশাক পরিধান করতে হয়। এর কারণ হলো—মহাবিশ্বের অবস্থা পৃথিবীর মতো না। সেখানে টি-শার্ট, প্যান্ট পরে থাকা যাবে না। থাকলে নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে।

যেহেতু মহাবিশ্ব একটা আলাদা জগৎ। এটা পৃথিবীর মতো না। পৃথিবীর মতো কোনো কিছুই সেখানে নেই। না আছে বাতাস, না আছে মাটি। তুমি সেখানে হাঁটাহাঁটিও করতে পারবে না। তাই পৃথিবীর কাপড়চোপড় পরে সেখানে থাকা যাবে না।

এই বিশেষ পোশাকের ভেতরে নভোচারীরা থাকে। তাদের দেখাই যায় না। পুরো শরীর ঢেকে থাকে। যেন এই পোশাকটাই হলো নভোচারী। কিন্তু যখন তারা পৃথিবীতে ফিরে আসে, তখন এই পোশাকটা খুলে নেওয়া হয়।

এবার বলো তো, পোশাক পরে থাকা নভোচারী আর পোশাক খুলে ফেলার পর নভোচারীর কোনো পার্থক্য আছে? একই ব্যক্তি না?

অবশ্যই একই ব্যক্তি।

পোশাক না থাকলেও তিনি একজন নভোচারী, তাই না?

অবশ্যই।

তাহলে পোশাকটা কী?

পোশাকটাকে কি আমরা নভোচারী বলতে পারি?

অবশ্যই না। কারণ, এটা একটা পোশাকমাত্র। হ্যাঁ, পোশাকটা সুন্দর। কিন্তু এটা একটা প্রাণহীন বস্তু। এটাকে কেউ পরিধান না করলে এর কোনো মূল্যই নেই।

এবার এই উদাহরণের সাথে মিলিয়ে তোমার শরীরের দিকে দেখো।

আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাদের রুহ সৃষ্টি করেছেন। জন্মগ্রহণের পূর্বে রুহগুলো আলমে আরওয়া তথা রুহের জগতে থাকে। যখন আমাদের দুনিয়ায় পাঠানো হয়, তখন আমাদের রুহকে তো একটা সুন্দর অবয়ব দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর আমাদের মায়ের গর্ভে তখন আমাদের জন্য উপযুক্ত একটা অবয়ব আল্লাহ সৃষ্টি করেন।

এই অবয়বের কোনো কিছু ধরার জন্য হাত থাকে। হাঁটাহাঁটির উপযুক্ত পা থাকে। শোনার জন্য কান থাকে। দেখার জন্য থাকে চোখ আর ঘ্রাণ যেন আমরা নিতে পারি, তাই থাকে নাক...

আমরা এই সুন্দর শরীর নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করি, কিন্তু এই শরীর আমরা নই। যেমন নভোচারী তার পোশাক পরে থাকেন মাত্র। পোশাক কখনোই নভোচারী না। ঠিক তেমনই আমাদের রুহ এই শরীরের মধ্যে অবস্থান করে মাত্র, এই শরীর রুহ না। রুহের পোশাক হলো শরীর।

এই পৃথিবীতে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেলে, শরীর নামক পোশাকটা খুলে নেওয়া হবে। এরপর আমরা আবার রুহের জগতে চলে যাব।

পৃথিবীতে চলার জন্য শরীর নামক যে পোশাক আমাদের পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আজরাইল এসে তা খুলে নেবে। কারণ, এটার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। কোনো দরকারেই লাগবে না। এটা ঠিক ওই নভোচারীর পোশাকের মতো। রকেটে করে মহাবিশ্বে যাওয়ার সময় তাকে এটা পরিয়ে দেওয়া হয়। আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার সাথে সাথেই সেটা খুলে নেওয়া হয়।

এরপর আমাদের রুহ চলে যায় কবরের জগতে। এটা এক আলাদা জগৎ।

এই পৃথিবীতে আসার পূর্বে যেমন আমরা মায়ের পেটে নয় কি দশ মাস ছিলাম, ঠিক তেমনি কবরেও আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে থাকতে হবে। হাশরের বিচারের আগপর্যন্ত। হাশর কী, তা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। পুনরুত্থানের পর সবার বিচার দিবস অনুষ্ঠিত হবে। এটাকেই হাশর বলে।

আল্লাহ আমাদের মায়ের পেটে একা ছেড়ে দেননি। ঠিক তেমনি কবরে যাওয়ার জন্যও একা ছেড়ে দেবেন না। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামিন। জগৎসমূহের রব। রুহের জগৎ, এই পৃথিবী, কবরের জগৎ, জান্নাত—সবকিছুর মালিক তিনি।

কবর কেমন জায়গা

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যকার মিলের আরেকটা উদাহরণ দেখাই তোমাকে। চলো তবে।

আমি যখন তোমার বয়সি ছিলাম, তখন আমাদের পাড়ায় এক বৃদ্ধা দাদি বাস করতেন। তার নাম ছিল রিনা খাতুন। আম্মু তাকে চাচি বলে ডাকতেন এবং খুব সম্মান করতেন। তিনি ছিলেন খুবই অমায়িক, সজ্জন ও ধার্মিক মহিলা। রিনা দাদি আম্মুর অনুরোধে আমাকে ও আমার বোনকে কুরআন পড়তে শিখিয়েছিলেন। তিনি খুব সুন্দর সুর করে তিলাওয়াত করতেন। তার তিলাওয়াত শুনতে আমার খুবই ভালো লাগত।

আম্মু একদিন রিনা দাদিকে বললেন—'চাচি, অনেক দিন তো হয়ে গেল। বাচ্চারা কদ্দুর শিখল?'

'আল্লাহ চাহেন তো এ বছরেই শিখে যাবে, ইনশাআল্লাহ।'

'ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ।'

'কিন্তু তাদের আমি শুধু কুরআন পড়া শেখাব না।'

'আর কী শেখাবেন তাদের?'

'আমি তাদের ধর্মীয় জ্ঞানও শেখাব।'

'খুব ভালো হবে চাচি। আল্লাহ আপনার ভালো করুন!'

'আল্লাহ আমাদের সবার ভালো করুন!'

আম্মু ও দাদির এই আলাপের পর আমি ও আমার ছোটো ভাই কায়দা বই হাতে নিয়মিতভাবে তার বাড়িতে যেতাম।

প্রথমে আমরা কায়দা পড়তাম। এরপর তিনি ছোটোদের জন্য লেখা একটি বই থেকে আমাদের নানান গল্প শোনাতেন। খুব মজার গল্প। গল্পগুলোয় কিছু শিক্ষাও থাকত। ওগুলো শুনলেই কীভাবে নামাজ পড়তে হয়, কী কী সূরা মুখস্থ করতে হয়, কীভাবে অজু করতে হয় ইত্যাদি জানা হয়ে যেত।

তিনি কতই-না উত্তম একজন শিক্ষক ছিলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন। তার পরকালকে আলোয় ভরিয়ে দিন, আমিন!

এমনই একদিন আমরা কুরআন পড়া শেষ করে তার গল্প শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি। তিনি এসে বললেন—'আজ তোমাদের কবরের গল্প শোনাব।'

কবর! শব্দটা শুনতেই আমরা মেরুদণ্ড টানটান করে বসলাম।

রিনা দাদির গল্প বলার পদ্ধতি ছিল, তিনি প্রথমে নরম সুরে, আস্তে আস্তে গল্প বলা শুরু করতেন। এরপর আস্তে আস্তে এমন উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যেতেন যে, পরের অংশটুকু শুনতে আমরা কান খাড়া করে থাকতাম।

কবরের আলোচনাটা একটু ভয়ংকর ছিল। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, তার শ্রোতা দুজন ছোট্ট বাচ্চা; পাড়ার মহিলারা নন। পাড়ার মহিলারা একসাথে কোথাও গোল হয়ে বসে গল্প করলে রিনা দাদি তাদের বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। নসিহা করতেন।

কিন্তু তিনি ভুলেই বসেছিলেন যে, আমরা দুজন ছোট্ট বাচ্চা, পাড়ার বয়স্ক মহিলা নই।

'তো বাবুরা! এরপর কবরে একজন ফেরেশতা আসবেন। তার হাতে থাকবে কাঁটাযুক্ত একটি লাঠি। তিনি সেই লাঠি দিয়ে আমাদের মাথায় এমনভাবে আঘাত করবেন যে, আমরা সাত তবক জমিনের ভেতর ঢুকে পড়ব।'

এ কেমন কথা! লাঠির আঘাতে অত গভীরে ঢুকে যাব কীভাবে? আমরা জোর করে হাসি চেপে রাখছিলাম। দাদির লাঠির আঘাতে ভেতরে ঢোকার বর্ণনা শুনে না হেসে থাকা যাচ্ছিল না। তিনি চোখ বন্ধ করে, হাত মুষ্টিতে করে রেখে বলেই চলেছেন—

'ফেরেশতা আমাদের সেখান থেকে ওঠাবে। এরপর আবার ওই লাঠি দিয়ে বুম করে এমন জোরে মারবে, আমরা আবার সাত তবক জমিনের নিচে ঢুকে যাব।'

এভাবে করে সেদিনের পড়া শেষ হওয়ামাত্রই আমরা চট করে ওনার বাড়ি থেকে দৌড় দিই। তার বাড়ির বাইরে আসামাত্রই হো হো করে হাসতে শুরু করি। প্রায় চার-পাঁচ দিন ওই বিষয়টা নিয়ে আমি ও ভাইয়া হাসাহাসি করতাম। 'লাঠি নিয়ে বুম করে মারবে, আর আমরা সাত তবক জমিনে ঢুকে যাব' হা হা হা।

আমি জানতাম, অন্যদের মতো আমিও একদিন মারা যাব, আমাকেও কবরে যেতে হবে। কিন্তু ওই কাঁটাযুক্ত লাঠির দ্বারা কি আসলেই আঘাত করা হবে?

আর কেনই-বা কবরের প্রতিজন ফেরেশতা এ রকম বিদঘুটে লাঠি নিয়ে থাকবেন? এটা কি কবরে স্বাগত জানানোর কোনো প্রথা? লাঠি হাতে নিয়ে তাঁরা আমাদের স্বাগত জানাবেন?

তবে দাদির গল্প শুনে হাসাহাসি করলেও আমি কেন জানি পরবর্তী সময়ে কাঁটাযুক্ত লাঠির ঘটনা বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম। তাই আমার মাথায় একটা বিষয় কাজ করত। যেভাবেই হোক, এই লাঠির আঘাত হতে বাঁচতে হবে।

সৌভাগ্যজনকভাবে যতদিন গেছে, আমি যত বড়ো হয়েছি, ততই কবর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আর ধীরে ধীরে দাদির শোনানো গল্প আমার মাথা থেকে বিস্মৃত হয়েছে।

আমরা কেন মৃত রুহকে দেখতে পাই না?

আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামের দুজন ছেলে ছিল। হাবিল ও কাবিল। একদিন হাবিলের সাথে কাবিলের কোনো একটা বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি হলো। আসলে হাবিল না;

কাবিলই মূলত তর্ক করছিল। সে ছিল একজন রাগী মানুষ। অল্পতেই রেগে যাওয়া তার স্বভাব ছিল।

তর্কের একপর্যায়ে কাবিল এতটা রেগে গেল যে, সে তার ভাই হাবিলকে মেরে ফেলল। এটা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম খুনের ঘটনা।

রাগের মাথায় খুন করার পর কাবিল খুব অনুতপ্ত হলো। সে চিৎকার করে তার ভাইবিয়োগে কাঁদতে লাগল। তার ভাইয়ের শরীরে হাত বুলিয়ে বিলাপ করতে লাগল। তার ভাইয়ের লাশকে এখন কী করবে, তাও সে বুঝতে পারছিল না। সে হা-হুতাশ করতেই থাকল।

এমন সময় সে লক্ষ করল, পাশেই একটা কাক মাটি খুঁড়ছে। কৌতূহলী হয়ে কাবিল কাকটির কর্মকাণ্ড দেখতে লাগল। কাকটি গর্ত খুঁড়ে মরা আরেকটি কাককে সেখানে পুঁতে কিছুক্ষণ এমনভাবে চুপ করে রইল, যেন সেটি খুব কষ্ট পেয়েছে। এরপর উড়ে চলে গেল।

এই দৃশ্য দেখে কাবিলও ভাবল, আমার ভাইকে এভাবেই কবর দেওয়াটাই উত্তম।

মূলত আল্লাহ এভাবেই তাকে পথ দেখিয়েছেন। না হলে একটা কাক কীভাবে জানল, কাবিল মর্মপীড়ায় ভুগছে?

এরপর থেকেই মৃতদেহকে কবর দেওয়ার নিয়মের প্রচলন শুরু হয়। আর মৃতদেহের জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো। হিন্দুরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। তুমি চিন্তা করো তো, তোমার সামনে তোমার বাবার দেহ আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে—এর চেয়ে বীভৎস দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। যাহোক, মৃতদেহের জন্য কবর দেওয়ায় সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। এতে মৃতদেহকে সম্মান জানানো হয় এবং পরিবেশও সুরক্ষিত থাকে।

আল্লাহ আমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। কবর দেওয়ার ফলে মাটির দেহ আবার মাটিতেই মিশে যায়। মাটির জিনিসকে মাটিতেই ফিরিয়ে দেওয়াটা উত্তম নয় কি?

মাটি হয়ে যাবে মাটি!

এক কবি বলেছেন—

'মাটি হবে মাটি, করো কেন কান্নাকাটি!'

তাহলে আমাদের রুহের কী হয়?

আমাদের শরীর মাটির সৃষ্টি। কিন্তু রুহ আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেননি। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেহেতু রুহ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তাই রুহকে কবর দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, তাই না?

তাহলে রুহের কী হয়?

মৃত্যুর পর মানুষকে কবরস্থ করা হয়। প্রচলিত অর্থে গর্তকেই কবর বলে। প্রকৃতপক্ষে কবর হচ্ছে ওই জায়গার নাম, যেখানে মানুষ আলমে বারজাখে থাকে। মানুষ মারা যাওয়ার পর থেকে

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মধ্যবর্তী যে সময় রয়েছে, তা-ই আলমে বারজাখ। এই আলমে বারজাখে মানুষ যেখানে থাকে, সেটাই তার জন্য কবর।

মৃত্যুর পর কাউকে যদি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, সমুদ্রই তার কবর। বাঘ বা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণীও যদি কাউকে গিলে ফেলে, ওই প্রাণীর পেটই তার জন্য কবর হবে। সেখানেই তার ওপর আজাব কিংবা নিয়ামতের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। এ আল্লাহর এমন এক বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যেখানে মানুষের বিবেকবুদ্ধি পৌঁছাতে অক্ষম।

একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারি। ধরো, কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি এমন দুঃস্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে কেউ একজন তাকে জোরে জোরে আঘাত করছে। সেও তা অনুভব করছে। কিন্তু তার পার্শ্বস্থ জাগ্রত ব্যক্তিটি তা টের পাবে না। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঠিক যেভাবে কষ্ট অনুভব করতে পারে, তার পাশে থাকা জাগ্রতরা সেভাবে অনুভব করতে পারে না। অনুরূপ কবরে থাকা ব্যক্তির ওপর যা বয়ে যায়, তা অন্যরা অনুভব করতে পারে না।

এটা আল্লাহর একটি রহস্য। রুহের সংযোগ দেহের সাথে এমনভাবে করে দেওয়া হয়, যাতে মৃত ব্যক্তিটি আজাবের কষ্ট বা নিয়ামতের স্বাদ অনুভব করতে পারে। মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তার দেহের সাথে রুহের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যায় না। সাময়িকভাবে ছিন্ন হলেও পুনরায় সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সংযোগ পার্থিব সংযোগের মতো নয়—যেমনভাবে জীবন্ত অবস্থায় পৃথিবীর সম্পর্কগুলো প্রতিষ্ঠিত থাকে।

কিন্তু এমনভাবে করে দেওয়া হয়, যেন দেহটির সাথে রুহের বিশেষ সম্পর্ক বজায় থাকে। ফলে মৃত ব্যক্তি আজাব ও নিয়ামত অনুভব করতে পারে। ইসলামি বিশ্বাস হলো, কেউ মারা গেলে আল্লাহ তায়ালা তার দেহের কোনো অঙ্গে বিশেষভাবে প্রাণ সঞ্চারিত করে দেন। এতে সে অনুভূতিশক্তি ফিরে পায়। এটা অপরিহার্য নয় যে, রুহটিকে পুরোপুরিভাবে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যার কারণে লাশটি নড়াচড়া, চলাফেরা করতে পারে, এমন কিছু নয়।

আমাদের বিশ্বাস হলো, মুসলমানদের রুহ তাদের মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে। কারও কারও রুহ থাকে কবরে। কারও কারও থাকে জমজম কূপে। কারও আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী কোথাও। কারও থাকে প্রথম আসমানে, কারও দ্বিতীয়, আবার কারও তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে। আবার কারও রুহ অবস্থান করে আলা ইল্লিয়্যিনে, এমনটাই এসেছে বিভিন্ন হাদিসে।

এরপর কবরে আমাদের কী হয়?

আল্লাহর রাসূল, আমাদের নবি বলেছেন, মৃতদেহকে কবরে রেখে আসার পর সেখানে দুজন ফেরেশতা হাজির হন। একজনের নাম মুনকার ও অপরজন নাকির।

মুনকার ও নাকির তিনটি সহজ প্রশ্ন করবে।

'তোমার রব কে?'

'তোমার নবি কে?'

'তোমার দ্বীন কী?'

প্রশ্নগুলো খুবই সহজ, তাই না? কিন্তু কবরে এই সহজ প্রশ্নগুলোরও অনেকেই উত্তর দিতে পারবে না।

শুনতে অদ্ভুত লাগছে?

যারা বেঁচে থাকার সময়ে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলবে না, তারা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে না। আর যারা দুনিয়ায় আল্লাহর নির্দেশ, রাসূলের দেখানো পথ ও ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলবে, তারাই কেবল এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে।

'আমার রব আল্লাহ। আমার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমার দ্বীন বা ধর্ম ইসলাম।' কত সহজ উত্তর!

কিন্তু যারা দুনিয়ায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথে চলেনি, নিজের ইচ্ছামতো যা ভালো লেগেছে করেছে, তা ইসলামে নিষেধ থাকলেও। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েনি, মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, নেশা-মদ এসব খেয়ে দিন পার করেছে, তারা এই সহজ তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তাদের মুখ দিয়ে সেদিন কোনো উত্তর বেরোবে না। তারা বোবা হয়ে যাবে।

ফেরেশতারা এই তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে গেলে বলবে—'আমরা জানতাম তুমি উত্তর দিতে পারবে।' তারা খুশি হবে। কারণ, ঈমানদারদের সকলে ভালোবাসে।

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জানবে ও মানবে, তারা সর্বদায় ফেরেশতাদের বন্ধু হবে। আর মনে রেখো, ঈমানদারদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হলো ফেরেশতারা।

সুখবর! সুখবর!

ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর সুন্দর ও সঠিকভাবে দিয়ে আমরা তাদের বন্ধু হয়ে গেলাম। এরপর আমাদের জন্য থাকবে সুসংবাদ। এই সুসংবাদ দুনিয়ায় আমাদের পাওয়া সবচেয়ে সুখবরের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি।

নতুন বন্ধু মুনকার ও নাকির প্রশস্ত হাসিমুখে আমাদের সেই সুখবর শোনাবে। সুখবরটা হলো, আমরা আল্লাহর রহমত পেয়েছি।

আর এরপরেই কবরের অন্ধকার আলোয় পরিণত হবে। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাব সবুজ সুন্দর এক উদ্যান। মনে হবে একটা সুবিশাল প্রাসাদের কামরায় আমরা শুয়ে আছি। পাখিরা কিচিরমিচির করে উড়ে যাচ্ছে। নদীর কলকল শব্দ কানে আসবে। আরও অনেক কিছু চোখে পড়বে, যা আমাদের মানবমন কল্পনাও করতে পারবে না।

আমাদের অন্তর সব সময় প্রশান্ত থাকবে। কোনো চিন্তা-ভয় থাকবে না। চিরশান্তির ঘুম ঘুমাব আমরা তখন। জান্নাতের প্রশান্তি ও সৌন্দর্য আমাদের ঘিরে রাখবে।

আল্লাহ এটায় কুরআনে বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> 'যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতঃপর তার ওপর দৃঢ় ও স্থির থেকেছে, নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে এবং তাদের বলে—ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না

এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, তোমাদের যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ায় তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাইবে, তা-ই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাঙ্ক্ষা করবে, তা-ই লাভ করবে।' সূরা হা-মিম সিজদা : ৩০-৩১

তাহলে যারা কবরের তিনটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে না, তাদের কী হবে?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেকেই ফেরেশতা মুনকার-নাকিরের করা তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে না। অথবা ভুলভাল উত্তর দেবে।

দুনিয়াতে এমন অনেক মানুষ আছে—যাদের আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে ঘিরে রাখেন। খাবার খাওয়ান, অক্সিজেন দেন, বিপদ হতে উত্তরণ করেন, পানি পান করান। এই রকম হাজারও নিয়ামত দেন। এরপরেও তারা আল্লাহর প্রশংসা করে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথে চলে না। আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন, তা করে। মানুষকে কষ্ট দেয়। দুর্নীতি করে। ঘুস খায়। অন্যের ক্ষতি করে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ওজনে কম দেয়। দোকানদারির সময় খারাপ পণ্য দেয়। আমানতের খেয়ানত করে। কথা দিয়ে কথা রাখে না। মিথ্যা মামলা ও সাক্ষ্য দেয়। এককথায় দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়।

তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথামতো চলতে চায় না।

সর্বদা খারাপ কাজ করে। ভালো-মন্দের বাছবিচার করে না।

আর অন্য সবার মতো একদিন তাদেরও মৃত্যু হবে। তাদের কবরস্থ করা হবে। এরপর যখন মুনকার-নাকির তাদের প্রশ্ন করবে, তুমি কি জানো তখন তারা কী উত্তর দেবে?

তারা ভুলভাল উত্তর দেবে। এই সহজ তিনটা প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারবে না। তাদের মুখ দিয়ে তখন কোনো কথায় বেরুবে না, যেন তারা বোবা হয়ে গেছে।

তখন মুনকার-নাকির বুঝে নেবে, এই লোকটি দুনিয়ায় খারাপ কাজ করে এসেছে। সে ভালো মানুষ না। তাই তারা তাকে স্বাগত জানাবে না; বরং শাস্তির ব্যবস্থা করবে। তারা জান্নাতের অসাধারণ সুন্দর উদ্যানগুলো দেখতে পাবে না। না দেখবে বয়ে যাওয়া রূপবতী নদী।

ঈমানদারদের জন্য কবর যেমন খুব সুখের জায়গা হবে, খারাপ লোকদের জন্য তা হবে কঠিন এক জায়গা।

তাহলে এ থেকে উত্তরণের জন্য কী করতে হবে? কী করলে কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে?

এর উত্তর একটাই। আর তা হলো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথে চলতে হবে। কুরআন পড়তে হবে। হাদিস পড়তে হবে। আল্লাহর রাসূল ও সাহাবিদের জীবনী পড়তে হবে। সর্বদা ভালো কাজ করতে হবে। কখনো মিথ্যা বলা যাবে না। মানুষের উপকার করতে হবে। সবাইকে সালাম দিতে হবে। কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। নামাজ পড়তে হবে। রমজান মাসে

রোজা রাখতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একজন হয়ে যাব।

চলো, আল্লাহর কাছে দুআ করি...

'হে আল্লাহ! আমাদের সহজ, সরল পথপ্রদর্শন করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন। আপনার সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা কবরে মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। যাদের আপনি জান্নাত উপহার দেবেন।

হে আল্লাহ! আমাদের প্রিয় যারাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাদের সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন। তাদের আপনার পছন্দের মেহমান হিসেবে কবুল করে নিন। আমরা যারা জীবিত আছি, তারা যেন আজীবন আপনার ও রাসূলের পথে চলতে পারি, সেই তাওফিক দিন।

হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন, আমিন।'